এক দুর্যোগময় রাতের জার্নি

কাজী জহিরুল ইসলাম

দ্রাগাশের আমরা একটি বাংলা নাম দিয়েছিলাম, দিগন্ত আকাশ। এমনি করে কসোভোর আরো বেশ কয়েকটি স্থানেরই বাংলা নামকরণ করেছিলাম আমরা। স্থানীয় নামগুলোর সাথে উচ্চারণগত মিল রেখেই হয়েছিল বাংলা নামগুলো। যেমন, সুহারেকার নতুন নাম হয়ে গেল শুভরেখা, মিত্রভিৎসা হয়ে গেল মৃত্যুভিসা, মালিশেভো হয়ে গেল মালিরসেবা, পেইয়া হয়ে গেল প্রিয়া আর প্রিজরেন হয়ে গেল প্রিয়জন। শুধু যে উচ্চারণগত মিল রেখেই নামগুলো করেছিলাম তা-ই না, প্রতিটা নামের অর্থগত তাৎপর্যও ছিল। প্রিজরেনে থাকতেন আমার অতিপ্রিয়জন, আমার প্রিয়তমা স্ত্রী মুক্তি ইসলাম। তিনিই ছিলেন কসোভোর একমাত্র বাংলাদেশী সিভিলিয়ান ইউএন ফিমেল পার্সোনাল। এই বরফের দেশে রোজ সকালে তিনি ৫০ কিলোমিটার পথ ড্রাইভ করে অফিসে যেতেন আবার সন্ধ্যায় অফিস শেষ করে বাড়ি ফিরতেন এই লম্বা পথ একা একা গাড়ি চালিয়ে। তার এই দুঃসাহসিক কর্ম অভিযান তখনকার (২০০০ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত) বাংলাদেশ কমিউনিটির কাছে প্রায় একটি বিস্ময়ই ছিল। হয়ত তার এই সাহসী ভূমিকার জন্যই, মুক্তি হয়ে উঠেছিল বাংলাদেশ কমিউনিটির সকলেরই প্রিয়জন। কাজেই প্রিজরেনের বাঙালী নাম প্রিয়জন খুব সার্থক নামকরণই হয়েছিল।

পাহড়ের ওপরে পাহাড়, তার ওপরে পাহাড়। এই পর্বতশৃঙ্গমালার চূড়ায়, হঠাৎ ভেলিতে গড়ে উঠেছে একটি সুপ্রাচীন কমুনা (মিউনিসিপ্যালিটি), দ্রাগাশ। যেখানে গেলে পাহাড়-পর্বতের চূড়া ছাপিয়ে দেখা যায় আকাশের দিগন্ত। আর তাই আমরা দ্রাগাশের নাম পাল্টে দিগন্ত আকাশ রাখতে একটুও বিলম্ব করলাম না। সেই আকাশের দিগন্তে, যেখানে খোলা জানালা দিয়ে অবলীলায় বিনা নিমন্ত্রণে ঢুকে পড়ে মেঘের দল, সেখানে বাস করেন আমাদের এক বাঙালী বন্ধু রকিব মন্ডল। রকিব বাংলাদেশ ইলেকশন কমিশনের জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, লিয়েন নিয়ে জাতিসংঘে কাজ করছেন অনেক বছর ধরে। তিনি এখন দ্রাগাশ কমুনার অর্থ ও বাজেট কর্মকর্তা।

শুক্রবার বিকেল। ঝকঝকে আকাশ। ওয়েদার ফোরকাস্টে দেখলাম শুক্রবার রাতের আকাশ বরফে ঢাকা। এতো ঝকঝকে রোদ, বরফ আসবে কোত্থেকে? ওয়েদার ফোরকাস্টকে আমলে নিচ্ছে না কেউ। আমি একটু কম্বলের নিচে কুন্ডলী পাকাচ্ছি দেখে দলের সবচেয়ে সাহসী সদস্য রমা ভট্টাচার্য, নৈর্ব্যক্তিক মন্তব্য ছুঁড়ছেন, ‘ওয়েদার ফোরকাস্টে ছিটে-ফোটা স্নো দেখলে কারো কারো আবার হাঁড়ে কাঁপন ধরে, তখন কম্বলের ভেতরটাই সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা‘ অন্যরা আমার দিকে তাকিয়ে হো হো করে হাসতে শুরু করলো। এই দুঃসাহসী নারীর একটি গল্প বলি। একদিন সন্ধ্যায়, সবে সূর্য ডুবেছে, আমার ওয়াকি-টকি হঠাৎ কথা বলে উঠলো। ‘জহির, লিমা ওয়ান কিলো‘। রেডিওতে কারো নাম বলা যায় না কিন্তু এই পরমাসুন্দরী অক্সফোর্ড ডক্টরেট বাঙালী রমনীকে এ কথা আর কত শেখাবো। নিজের কল সাইনটি তিনি কখনোই ঠিকমতো বলতে পারেন না। তার কল সাইন হলো, লিমা কিলো-ওয়ান, তিনি সবসময় বলেন, লিমা ওয়ান-কিলো। তার কিঞ্চিৎ নাদুশ-নুদুশ গঠনের দিকে ইঙ্গিত করে আমরা অবিকল তার সুর নকল করে মাঝে মাঝেই বলতাম, ‘লিমা ওয়ান-হানড্রেড কিলো‘। এতে তিনি কখনোই ক্ষেপতেন না, বলতেন, ঠিকই বলেছো ভায়া। এরপর এই শরীর নিয়েই ধ্রুপদী নৃত্যের কয়েকটা মুদ্রা দেখিয়ে দিতেন। ফ্লোরের তখন ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। আজ এতো বছর পর এখন মনে হচ্ছে, ওই নাচটি দিয়ে হয়ত রমাদি বোঝাতে চাইতেন, দেখো আমি এখনো নাচতে পারি। অতটা মুটিয়ে যাইনি। ওয়াকি-টকিতে ওয়ান কিলোর ডাক শুনেই বুঝে ফেলেছি আমাদের দুঃসাহসী দিদি‘র কিছু একটা সমস্যা হয়েছে। আমি তার লোকেশন জানতে চাইলাম, তিনি তোতলাচ্ছেন। রেডিও কমিউনিকেশনের সমস্ত নর্মস ভঙ্গ করে তিনি বাংলায় কথা বলতে শুরু করলেন। ঠিকমতো লোকেশনটাও বলতে পারছেন না। শুধু বলছেন, একদল বখাটে ছেলে আমাকে ফলো করছে। আমিতো আর জেমস বন্ড না। একদল বখাটে ইউরোপিয়ান ছোকরাকে কুপোকাত করে এক সুন্দরী রমনীকে উদ্ধার করে নিয়ে আসবো। এখন আমার কি করা উচিত? সিকিউরিটিকে জানাতে পারি। আমি অবশ্য সিকিউরিটিকে জানালাম না। কাপড় বদলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। মাদার তেরিজা স্ট্রীটের দিকে হাঁটছি। এখান থেকে রমা‘দির অফিস বড়জোর তিন‘শ মিটার। শ‘খানেক মিটার হাঁটার পর দেখি তিনি একটি চেবাব (কাবাব)-ঘরের পাশে স্টিফ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। চেবাবের চুলো থেকে বেরিয়ে আসা ধোয়ায় তার মুখ আচ্ছন্ন। আমাকে দেখে রমাদি

যেন অথই সমুদ্রে একটা মরা ডাল পেলেন। বললেন, কোনদিকে তাকাবে না, সোজা বাড়ি চলো। আমি অবশ্য সবদিকেই তাকালাম, আশে-পাশে দর্শনীয় কাউকে দেখতে পেলাম না।

আমার সাহসের ইগোতে খোঁচাটা বেশ লাগলো। সকলের আগে আমিই তৈরী হয়ে নিলাম। সারা সপ্তাহ ধরে সবাই প্লান করছে এই ইউক-এন্ডে দিগন্ত-আকাশে যাবে, রকিব আমাদের জন্য খাসি জবাই করে ফ্রিজ ভরে রেখেছে, কাজেই মিস করা যাবে না। বারবিকিউ-র সুস্বাদু মাংসপোড়া ঘ্রাণ এসে আমার নাকে লাগছে। ক্ষুধা চার দিয়ে উঠছে। স্টিয়ারিংয়ে নিজাম ভাই। পাশে আমি, পেছনে রমাদি আর মুক্তি। চারজনের এই দলে একমাত্র নিজাম ভাই আর মুক্তি গাড়ি চালাতে জানে, আমরা দুই ভাই-বোন, নিজাম ভাইয়ের ভাষায় অকম্মার ঢেকি। সাধারণত এ জাতীয় লঙ ড্রাইভে নিজাম ভাইয়ের ওপর দিয়েই ধকলটা যায় বেশী। মুক্তি হলো স্ট্যান্ড বাই ব্যাক-আপ সাপোর্ট। নিজাম আহমেদ অস্ট্রেলিয়াতে সেটেলড। একসময় তিনিও বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা ছিলেন। পড়াশোনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে। কাজেই নিজে লেখালেখি না করলেও সাহিত্যের একজন বিশ্বস্ত পাঠক ও সমঝদার মানুষ তিনি। আমার দায়িত্ব হলো নিজাম ভাইয়ের সেবা যত্ন করা আর তাকে মজার মজার গল্প বলে চাঙ্গা রাখা, নইলে তিনি যে কোন সময় ঘুমিয়ে পড়তে পারেন। তিনি মাঝে মাঝে বলেন, পানি। আমরা ব্যস্ত হয়ে পড়ি তার মুখে পানি তুলে দেবার জন্য। যখন তিনি বলেন, চিপস। আমি প্রতি দশ-পনের সেকেন্ড পরপর একটা করে চিপস তুলে দিই তার মুখে আর তিনি সেটা আরাম করে চিবোন। একটা শেষ হলেই হা করে থাকেন পরেরটার জন্য। রাক্ষস নাকি? দিতে দেরী হলেই কটমট করে তাকান আমার দিকে। কখনো যদি হুঙ্কার ছেঁড়ে বলেন, এতো দেরী কেন? তখন পেছন থেকে দুই দেবীমূর্তি আমার প্রতি অগ্নিবান নিক্ষেপ করেন। মনে মনে বলি, এবার প্রিষ্টিনা ফিরে গিয়েই স্টিয়ারিং ধরবো। ড্রাইভিংটা শিখে ফেলতেই হবে। অন্যের হাতে বোতল রেখে উনার এই দুধু খাওয়ার মতো চুষে চুষে পানি খাওয়া আর হুঙ্কার ছেড়ে রাজাগিরি করা আমার একদম সহ্য হচ্ছে না।

মালিশেভো, সুহারেকা পেরিয়ে আমরা এখন কসোভোর ডিভিশনাল শহর প্রিজরেনে। এখন আমাদেরকে যেতে হবে সোজা উত্তরে। এখান থেকে দ্রাগাশ ত্রিশ কিলোমিটার পথ, পুরোটাই পাহাড়ি এবং ভয়ঙ্কর রিস্কি ড্রাইভ। কখনো কখনো গাড়ি এতোটাই খাড়া হয়ে ওপরের দিকে উঠতে থাকে মনে হয় যেন পেছন দিকে উল্টে পড়ে যাচ্ছে। সবচেয়ে ভয়ের ব্যাপার হলো, যদি কোন কারণে একবার স্টার্ট বন্ধ হয়ে যায় তাহলে গাড়ির নিয়ন্ত্রণ ঠিক রাখা খুবই কঠিন। পাহাড়ের খাঁজ কেটে নির্মিত এসব রাস্তাগুলো খুবই টাইনি, ওপর থেকে নামতে থাকা স্থানীয় গাড়িগুলো প্রায়শই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে, গড়িয়ে পড়ে ওপরে উঠে আসা গাড়ির ওপর। এই রাস্তায় সপ্তাহে অন্তত একটি/দুটি এক্সিডেন্ট অবধারিত। মাঝে মাঝে দেখা যায় পাচ/ছয়'শ ফুট নিচে কোন পাইনগাছের ডালে ঝুলে আছে একটি নতুন মার্সিডিজ বেঞ্জ। পাথরের পাহাড়ে বাড়ি খেয়ে গাড়ি এবং যাত্রী-চালকের হাঁড় ছাতু হয়ে যায় নিমিষেই। এ পথে এক্সিডেন্ট করা কোন যাত্রী বেঁচে আছে এমন নজির নেই। মাঝে মাঝে লাশই খুঁজে পাওয়া যায় না। আর বরফের দিনে হলেতো কথাই নেই। লাশটা ডিপফ্রিজে জমা থাকবে এক বছরের জন্য। পচবে-গলবে না। শক্ত পাথর হয়ে যাবে।

হঠাৎ করে ঠান্ডাটা যেন বেড়ে গেল। প্রিজরেন থেকে কিছু সফট ড্রিংকস, কিছু চিপস, ফ্রুটস আর মন্ডলের জন্য কিছু খাবার-দাবার কিনতে গিয়েই কনকনে ঠান্ডার দাপটটা টের পেলাম। নিজাম ভাই বললেন, এই সেরেছে রে, তুষার পড়তে শুরু করবে। মাঙ্কি ক্যাপটা কান অব্দি টেনে দিয়ে ওভারকোটের বুতামগুলো লাগিয়ে নিলাম। দোকান থেকে ফিরে আর গাড়িতে উঠতে পারলাম না। মনে হচ্ছে কেউ আশ-পাশের উচু বাড়িগুলো থেকে অনেকগুলো শিমুল তুলোর বালিশ ছিড়ে ছেড়ে দিয়েছে বাতাশে।

উড়তে উড়তে, দুলতে দুলতে শুভ্র তুষারদেবীর ডানার পালক খসে খসে পড়ছে আমাদের মাথার ওপর। আমাদের মাঙ্কি ক্যাপ, ওভারকোট শাদা হয়ে উঠছে। নিজাম ভাইয়ের কপালে দুশ্চিন্তার গাঢ় রেখা দেখতে পাচ্ছি। দলের দুঃসাহসী অভিযাত্রী রমাদি হঠাৎ বলে উঠলেন, আমরা বরং আজ রাতটা প্রিয়জনের কোন হোটেলে কাটিয়ে দিই, কাল সকালে দিগন্ত-আকাশে রওনা হবো। দিনের আলোতে জার্নিটা এনজয় করা যাবে। রমাদি সাধারণত স্থানীয় নামগুলোর বাংলা সংস্করণটিই ব্যবহার করেন, কালে-ভদ্রে লোকাল নামগুলো উচ্চারণ করেন তিনি। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। তুষারপাতও ঘন হচ্ছে। চারজন মিলে একটু শলা-পরামর্শ করে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিলাম, আর দেরী না করে এক্ষুণি গাড়ি স্টার্ট দেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। এতোদূর এসে আর ফিরে যেতে চাই না। অন্ধকারে জার্নিটা বেশ থ্রিলিং হবে, পাহাড় থেকে গাড়ি খসে পড়লেও কেউ দেখবেনা। কি বলেন রমাদি? খোচাটা যাতে গায়ে না লাগে এজন্য তিনি আমার কথাগুলো শুনতেই পেলেন না।

এখান থেকে উত্তরে মাত্র বিশ কিলোমিটারের একটি স্ট্রেইট রাস্তা, গিয়ে মিশেছে আলবেনিয়ার বর্ডারে। বর্ডারের কাছে একটি দারুণ রেস্টুরেন্ট আছে। প্রবাহিত জলধারার দুপাশে জালের বাধ দিয়ে চাষ করা হয় ট্রাউট মাছ। তারই একপাশে পাহাড়ের ঢালে, গাছপালার আঁড়ালে একটি রেস্টুরেন্ট। তাজা মাছের জন্যই এই রেস্টুরেন্টটি বিখ্যাত। আঙুল তুলে দেখিয়ে দিলেই হলো, আমি ওই মাছটি খেতে চাই। ব্যাস, দক্ষ শিকারীরা রেস্টুরেন্টের চারপাশে তৈরী করা জলের ঘুর্ণন থেকে ঠিকই কাস্টমারের পছন্দের মাছটি ধরে আনবে। তারপর বারবিকিউ করে পনের মিনিটের মধ্যে নানান রকম মশলা, ফাফারোনি ও ফ্রেশ শব্জির সালাদসহ পরিবেশন করবে গরম গরম মাছ। একবার আমরা দশ বাঙালী গেলাম মাছ খেতে। প্রতিটা মাছের দাম ১৫ ডয়েশ মার্ক। দাম শুনে আমাদের খুরশিদ আনোয়ার নিরামিষভোজি হয়ে গেলেন। খুরশিদ বাংলাদেশ ইলেকশন কমিশনের ডেপুটি ইলেকশন কমিশনার। ঢাকার ইস্কাটনে পৈত্রিক বাড়ির ভাড়া পান মাসে এক লাখ টাকা। এই বিদেশ বিভুইয়ে অমন সুন্দর পাহাড়ে-অরণ্যে, জলাশয়ের পাড়ের নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ভেতরে অবগাহনরত একটি চমৎকার রেস্টুরেন্টে বসে ১৫ মার্ক খরচ করতে এই ভদ্রলোকের এতো কার্পণ্যের কারণ আমি বুঝতে না পারলেও, আমাদের আরেক বন্ধু কবি জাহিদ হায়দার এর একটি চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। জাহিদের মতে, আমরা যেমন ১৫ মার্ক দিয়ে আনন্দ কিনছি ও তেমনি ১৫ মার্ক সেইভ করে আনন্দ পাচ্ছে। ও ভাবছে ও বুদ্ধিমান, আর আমরা ভাবছি আমরা বুদ্ধিমান।

বর্ডারের প্রায় কাছাকাছি গিয়ে আমরা বাঁদিকে টার্ন করলাম। মূলত আমরা পর্বতশৃঙ্গমালায় অনুপ্রবেশ করলাম। এখনো পুরোপুরি সন্ধ্যা হয়নি। তুষারপাত তেমন ঘন না হলেও এখনো বন্ধ হয়নি। পথের ওপর বরফের শুভ্র একটি হালকা প্রলেপ পড়েছে। আরো ঘন্টাখানেক এই গতিতে তুষারপাত হলে চার/পাঁচ ইঞ্চির একটি আস্তরণ তৈরী হয়ে যাবে। আমাদের পৌছুতে হবে এ অবস্থা তৈরী হবার আগেই। নইলে বড় রকমের কোন বিপদে পড়ে যাবার সম্ভাবনা আছে।

পাহাড়ের টিকিতে উঠে হঠাৎ মনে হলো গাড়ি যেন আর চলছে না। ডানে তাকিয়ে কলিজা শুকিয়ে গেল। খাড়া পাহাড় নেমে গেছে কম করে হলেও পাঁচ হাজার ফুট নিচে। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি স্টিয়ারিংয়ে নিজাম ভাইয়ের হাত কাঁপছে। গাড়িটা আস্তে আস্তে পেছন দিকে সরে যাচ্ছে, তিনি ক্রমাগত এক্সেলেটর দাবাচ্ছেন কিন্তু কোন কাজ হচ্ছে না। গাড়ি শুধু ঘ্যাঁ ঘ্যাঁ শব্দ করছে। পেছন থেকে মুক্তি বললো, ফোর হুইল দেন, ফোর হুইল দেন। তিনি যেন খানিকটা দিশেহারা। রমাদি বলছেন, ও জহির, আমরা কি গাড়ি থেকে নেমে যাবো? বুঝতে পারছি আমরা সবাই বেশ পাজেল্ড। নিজাম ভাই ক্রমাগত চেষ্টা করে যাচ্ছেন, ফোর হুইল লাগাতে পারছেন না। পাশের সীটে বসে থেকে কোন সাহায্যই করতে

পারছি না দেখে নিজেকে খুবই অপাঙক্তেয় লাগছে। এখান থেকে বাঁক নিয়ে বাঁ দিকে একেবারে ইউ টার্ন করে এগুতে হবে। আর এজন্যই বোধ হয় চাকা পিছলে যাচ্ছে। আমাদের উচিৎ ছিল স্নো চেইনটা প্রিজরেন থেকেই লাগিয়ে নেয়া। হয়েছে, হঠাৎ নিজাম ভাই কথা বলে উঠলেন। আমি ডেশবোর্ডে তাকিয়ে দেখি, ফোর হুইলের সাইনটা দেখা যাচ্ছে। এবার গাড়ি কথা শুনতে শুরু করেছে।

দ্রাগাশের কাছাকাছি এসে গেছি। এখান থেকে বাকী তিন/চার কিলোমিটার পথ মোটামুটি সমতল। তবে পথের দুপাশে কোথাও খাড়া পাহাড় আবার কোথাও গভীর খাদ। সেইসব পাহাড়ে, খাদে সারি সারি পাইনের বন। এই অঞ্চলে পাইনের ঘন বন আছে বলেই এই বরফের দিনেও মনে হচ্ছে আমরা একটি সবুজ বনভূমি অতিক্রম করছি। এছাড়া সারা কসোভোই এখন রুক্ষ, ধুসর। শীত আসার সাথে সাথেই পাতা ঝরতে শুরু করে। তুষারের ছোঁয়া পেলেতো এক দিনেই সব পাতা ঝরে গিয়ে শুধু ন্যাড়া কান্ডগুলি ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। ঝাউ এবং পাইনের কোন ক্ষতি হয়না তুষারপাতের ফলে। এই গাছগুলি বুঝি বরফের দেশের জন্যই ঈশ্বর বানিয়েছেন।

মন্ডলের সাথে সারাক্ষণই আমাদের যোগাযোগ হচ্ছে মোবাইলে। সামনে একটি শাদা ইউএন জীপ দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, ওটাই মন্ডলের গাড়ি। এই দুর্যোগপূর্ণ সন্ধ্যায় বেচারা আমাদের রিসিভ করার জন্য এতোটা পথ এগিয়ে এসে দাঁড়িয়ে আছে। হাঁড় কাঁপানো ঠান্ডা পড়েছে। তাপমাত্রা এখন হিমাঙ্কের নিচে ছয় ডিগ্রী। মন্ডলকে গ্রিট করার জন্য আমরা কেউই গাড়ি থেকে নামলাম না। জানলার কাচ খুলে আবার সুড়ুৎ করে তা বন্ধ করে দিয়েছি। পাশাপাশি দুটো গাড়ি অথচ আমরা শীতের অত্যাচারে কথা বলছি টেলোফোনে। চারজনই ওর সাথে মোবাইলে কুশল বিনিময় করে শহরের দিকে ছুটে চললাম। মন্ডল আমাদের গাইড করে নিয়ে এলো ওর বাসার দরোজায়।

মন্ডলের তুর্কি কাজের মেয়ে মুরগীর ঝোল রান্না করেছে আর স্টাফড ফাফারোনি বানিয়েছে আমাদের জন্য। টেনশনে বুঝি ক্ষুধা বেড়ে যায়। আমরা যারপরনাই ক্ষুধার্ত। একটা আস্ত বালিশের মতো রুটি, স্থানীয় ভাষায় যেটাকে বুক বলে, সেটার ওপর সবাই যেন একসঙ্গে ঝাপিয়ে পড়লাম। বুকের গা কুমীরের চামড়ার মতো রুক্ষ, আর চারার মতো শক্ত। খোসা ছাড়ালেই এর নামকরণের সার্থকতা মেলে। তখন বুক সত্যিই হয়ে ওঠে নারীর বুকের মতো মোলায়েম। মুরগীর ঝোলে ভিজিয়ে গরম গরম বুক খেতে অসাধারণ লাগছে। নিজাম ভাই প্লেট থেকে মুখ তুলে বললেন, হাঙ্গার ইজ দি বেস্ট সস মাই ডিয়ার। খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে আমরা মন্ডলের তুর্কি কাজের মেয়েটো সম্পর্কে টুকটাক খোঁচাখুঁচিও করছিলাম।

ওর ফ্ল্যাটে তিনটা বেডরুম থাকলেও বড় হিটার আছে মাত্র দুটিতে। অন্য ঘরটিতে একটি কয়েলের ছোট্ট হিটার। আজ যে পরিমান ঠান্ডা পড়েছে এই হিটারে মোটেও কাজ হবে না। বড় হিটারগুলো একটি আয়তাকার লোহার বাক্স, ভেতরে ডজনখানেট ইট। এগুলোও বিদ্যুতে চলে। ইট-লোহার এই হিটারগুলো খুবই কার্যকর। ঘন্টা দুয়েক অন থাকলেই হয়। এরপর ছয় থেকে আট ঘন্টা অফ রাখলেও ওতে যে পরিমান তাপ সঞ্চিত থাকে তাতেই ঘর গরম থাকে। এ জাতীয় হিটার যুগোস্লাভিয়া ছাড়া আর কোথাও নেই।

দুঃখিত, দম্পতিকে তেমন উষ্ণ একটি ঘর দেওয়া গেল না। আরামে ঘুমাতে চাইলে ঘর শেয়ার করেন। আর অন্য উদ্দেশ্য থাকলে ঠান্ডায় মরেন। এ কথা বলেই নিজাম ভাই কম্বলের নিচে ঢুকে নাক ডাকাতে শুরু করে দিয়েছেন। শেষমেষ আমাদের সাথে রমা'দি, অন্য ঘরে মন্ডল এবং নিজাম ভাই।

ভোরে উঠে দেখি বাইরে সোনাঝরা রোদ। একটি কনকচূড় সকাল। জানালার পর্দা সরিয়ে কাচের ওপাশে চোখ রেখে দেখি, ওমা এ যে তুষারের মহাসমুদ্র। যতদূর চোখ যায় শুধু শাদা আর শাদা। শুভ্র তুষারের প্রান্তরেখা মিশেছে গিয়ে দূরের নীল আকাশের প্রান্তে। তুষারের শুভ্র সমুদ্রে সকালের সোনাঝরা রোদ পরে যেন এর দ্যুতি আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। বাসি তরকারী আর ঠান্ডা রুটি, সেই সাথে রকিব ঝটপট কয়েকটি ডিম ভেঙে টমেটো আর অনিয়ন দিয়ে স্ক্র্যাম্বল্ড করে নিয়ে এলো। দ্রুত নাস্তা সেরে আমরা বেরিয়ে পড়লাম পিকনিক করতে। রকিব জানালো, এখান থেকে উত্তরে যেতে থাকলে আমরা আরো খানিকটা পাহাড়ের ওপরে উঠে যাবো। ওখান থেকে দ্রাগাশের পুরো ভিউটা দেখা যাবে, নিচের ভেলিগুলোও স্পস্ট হয়ে উঠবে। এই পথটি গিয়ে মিশেছে একটি রোমা গ্রামে। আমরা ওই গ্রাম থেকে জ্যান্ত মুরগী ধরে আনবো। তারপর কোন একটা সমতলে বসে মুরগী রান্না করে খাবো। গ্রেট আইডিয়া।

রোমা গ্রামটিতে পৌছে মনে হলো পুরোনো ঢাকার একটি মহল্লায় ঢুকেছি। যে মহল্লার মানুষ এই ঘিঞ্জি শহরের ছোট্ট কুঠুরিতে বাস করেও এখনো হাস-মুরগি, গরু-ছাগল পালন বন্ধ করেনি। একটি বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে যাওয়ার তেমন বিশেষ কোন রাস্তা নেই। পাশাপাশি অবস্থানরত দুটি ঘরের মাটির দেয়াল সংঘর্ষ এড়াতে একটি অন্যটির দিকে পেছন ফিরে যেটুকু দুরত্বে দাঁড়িয়ে থাকে এবং তাতে যেটুকু প্যাসেজ তৈরী হয়, ওটিই হাঁটার রাস্তা। এইরকম ফাকফোকর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গোবরে-তুষারে সারা গা মাখিয়ে এসে পৌছলাম গ্রামটির শেষপ্রান্তে। এখানে একটি ছোট্ট নদী গ্রামটিকে পাশ কাটিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে ক্ষিপ্র গতিতে। টলমলে পানি দেখে ওভারকোটের নিচের অংশে লেগে থাকা কাদা-গোবর ধুতে ছুটে গেলাম কেউ কেউ। কিন্তু পানিতে হাত দিয়েই ছিটকে বেরিয়ে এলাম। মাই গড, এতো ঠান্ডা! রোমাদের গায়ের রঙ ভারতীয়। এই জিপসি জাতিটি প্রায় ১ হাজার বছর আগে ভারতের সিন্ধ এবং পাঞ্জাব থেকে ইরান হয়ে উত্তর আফ্রিকা, দক্ষিণ এবং পূর্ব ইওরোপ এবং পরবর্তিকালে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকাসহ পৃথিবীর নানান দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ওরা তেমন স্থায়ী আসন গাড়ে না কোথাও। ইওরোপের প্রায়

সর্বত্রই এখন ওদের দেখা যায় ভিক্ষাবৃত্তি করতে। আমাদের দেশের বেদে সম্প্রদায়ের মতো অনেকটা ওদের বৈশিষ্ট। কয়েকবছর এক জায়গায় থাকে। তারপর লটবহর নিয়ে আবার পাড়ি জমায় অন্য কোন শহরে বা দেশে। নানান রকম আদিভৌতিক বিষয়-আশয়ে ওরা বিশ্বাস করে। ইতালীর কোথাও কোথাও এবং পূর্ব ইওরোপের প্রায় সব শহরেই ওরা আছে। ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়া ওরা কিছু অতি অস্থায়ী কাজ-কর্ম করে। বিন থেকে ময়লা ঘেটে বোতল, কাগজ এইসব কুড়াতেই দেখা যায় এদেরকে। রোমাদের একটা নিজস্ব ভাষা আছে, যে ভাষাটির নাম রুমানি। তবে ওরা যে অঞ্চলে বসবাস করে সেখানকার নেটিভ ভাষায়ও কথা বলে। অতি সম্প্রতি রোমা সম্প্রদায় নিজেদের একটি জাতীয় পতাকা তৈরী করেছে। আয়তাকার এই পতাকাটির নিচের অর্ধেক সবুজ এবং ওপরের অর্ধেক নীল। আর ঠিক মাঝখানে একটি লাল রঙের গরুর গাড়ির চাকা। অনেকটা ভারতীয় পতাকার আদলেই তৈরী রোমাদের জাতীয় পতাকা। অতি দুঃখজনকভাবে রোমা সম্প্রদায়ের নিজস্ব কোন ভূখন্ড নেই। সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মোট রোমা জনসংখ্যার পরিমান ৮০ লক্ষ থেকে এক কোটি। এদের একটি বৃহৎ অংশ বাস করে পূর্ব ইওরোপে, বিশেষ করে রোমানিয়া, হাঙ্গেরি, মেসিডোনিয়া এবং কসোভোতে। গ্রীসেও প্রায় ৫ লক্ষ রোমা জনগন বসবাস করে। ইন্দো-এ্যরিয়ান এই সম্প্রদায়ের উৎপত্তিস্থল নিয়ে নানান লেখক এবং ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও আমি নিশ্চিত যে এদের আদি নিবাস ভারত উপমহাদেশে। ওরা যে আচার-অনুষ্ঠান কিংবা সামাজিক রীতি-নীতি পালন করে একজন ভারত উপমহাদেশিয় হিসাবে আমিতো অন্তত বুঝি যে এটা আমাদেরই সংস্কৃতি। গজনির সুলতান মাহমুদ যখন সিন্ধি ও পাঞ্জাব জয় করে তখন ৫ লক্ষ রোমা জনগনকে বন্দী করে তুরস্ক ও ইরানে নিয়ে আসে। এইসব নিচুবর্ণের হিন্দু রোমা জনগোষ্ঠি পরবর্তিতে মুসলিম সেনাদলে যোগদান করে তুরস্ক ও পারস্য অঞ্চলে বসবাস করতে শুরু করে এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহন করে।

রোমা সম্প্রদায় এখন বৃহৎ ৫টি উপ-সম্প্রদায়ে বিভক্ত। সবচেয়ে বড় উপ-সম্প্রদায়টি হচ্ছে *কালদেরাশ।* সংখ্যায় এরাই সবচেয়ে বেশি। এদের মূল আবাসস্থল হলো বলকান, তবে বিপুল সংখ্যক *কালদেরাশ* রোমা মধ্য ইওরোপ এবং উত্তর আমেরিকায় পাড়ি জমিয়েছে। এরপরেই আছে *গীতানোস।* এদেরকে *ক্যালে* বলেও ডাকা হয়। মূলত এরা নানান রকম ভেল্কিবাজি, সার্কাস ও বিনোদনমূলক খেলাধুলার সাথে জড়িত। *গীতানোসদের* আবাসস্থল হলো উত্তর আফ্রিকা এবং দক্ষিণ ফ্রান্স এলাকায়। এরপরেই আছে *সিন্তি* উপ-সম্প্রদায়। *সিন্তিদের* আরেকটি নাম আছে, *মানুষ।* এরাও সার্কাস দেখায়, গান-বাজনা করে বেড়ায়। এই গোত্রটি জার্মানী, ফ্রান্সসহ পশ্চিম ইওরোপের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাস করে। চতুর্থ গোত্র হলো *রোমনিচাল।* এদেরও একটি দ্বিতীয় নাম আছে, *রোমনিজ। রোমনিচালরা* গ্রেট ব্রিটেন এবং উত্তর আমেরিকায় বসবাস করে। তুরস্কে এবং দক্ষিণ-পূর্ব ইওরোপে বসবাস করে *ইরলিদেস* গোত্রটি। এরাও স্থানভেদে *ইয়েরলি* বা *আরলি* নামে পরিচিত।

এই ৫টি মূল উপসম্প্রদায় আবার পরবর্তিকালে আরো অসংখ্য ছোট ছোট উপদলে বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর নানান স্থানে। স্থানীয় সংস্কৃতি, ধর্ম ও আচার-অনুষ্ঠানের প্রভাবেই ধীরে ধীরে নতুন নতুন উপদল তৈরী হয়েছে। এইসব উপদলগুলোর মধ্যে *মাচভায়া, লোভারি, চুরারি, রুদারি, বয়াশ, লুদার, জোরাজাই, উঙ্গারিদজা, বাশালদে, উরসারি এবং রোমুঙ্গরো* উল্লেখযোগ্য।

সংস্কৃত *দোমা* শব্দ থেকেই রোম শব্দের উৎপত্তি, যার বহুবচন হচ্ছে রোমা। দোমা শব্দের অর্থ হলো মানুষ। রোমারা ওদের ভাষা রোমানি'র বর্ণমালাও তৈরী করেছে। অতীতকালে ধারণা করা হতো রোমাদের উৎপত্তিস্থল হলো মিশরে। শাস্তিস্বরূপ ওদেরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করা হয়। সেই থেকেই ওরা দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়, ভেল্কিবাজি দেখায়, যাদুটোনা করে। এজন্যই ওদেরকে বলা হয় জিপসি জাতি।

জেনেটিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে রোমাদের সাথে দক্ষিণ এশিয় জনগণের সবচেয়ে বেশি মিল রয়েছে। রোমারা শুধু যে একান্নবর্তি পরিবার প্রথায় বিশ্বাসী তা-ই নয়, ওরা এখনো গোত্রগত বা দলগতভাবে বসবাস করতে পছন্দ করে। ওরা তিন-চার জেনারেশন পর্যন্ত একান্নবর্তি পরিবারে বসবাস করে। খুবই অল্পবয়সে ছেলে-মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেয়। উন্নত বিশ্বে রোমাদের গ্রহনযোগ্যতা নিয়ে প্রায়ই প্রশ্ন ওঠে, এর একটি বড় কারণ হলো, ওদের সমাজের বাল্যবিবাহ প্রথা। বিয়ের ক্ষেত্রে ছেলের বাবা মেয়ের বাবাকে যৌতুক দিয়ে থাকে। এ বিষয়ে রোমাদের নিজস্ব আইন রয়েছে। রোমাদের একটি বড় সংস্কার হলো শুদ্ধতা। ওরা বিশ্বাস করে মানব শরীর অপবিত্র। বিশেষ করে গোপন অঙ্গসমূহ। এজন্য অন্তর্বাসসমূহ ওরা ধৌত করে আলাদাভাবে, সম্ভব হলে বাড়ি থেকে দূরে কোথাও। গর্ভবতী মায়েরা

সন্তান প্রসব করে মূল বাড়ি থেকে দূরে, আঁতুরঘরে। কারণ ওরা বিশ্বাস করে এ সময়ে সন্তান ও মা দু'জনই অপবিত্র থাকে। প্রসবিনীকে চল্লিশদিন পর্যন্ত অশুচি মনে করা হয়। কেউ মারা গেলে হিন্দুদের মতো ওরাও বেশ কিছুদিন স্বল্পাহারসহ নানান আচার-অনুষ্ঠান পালন করে।

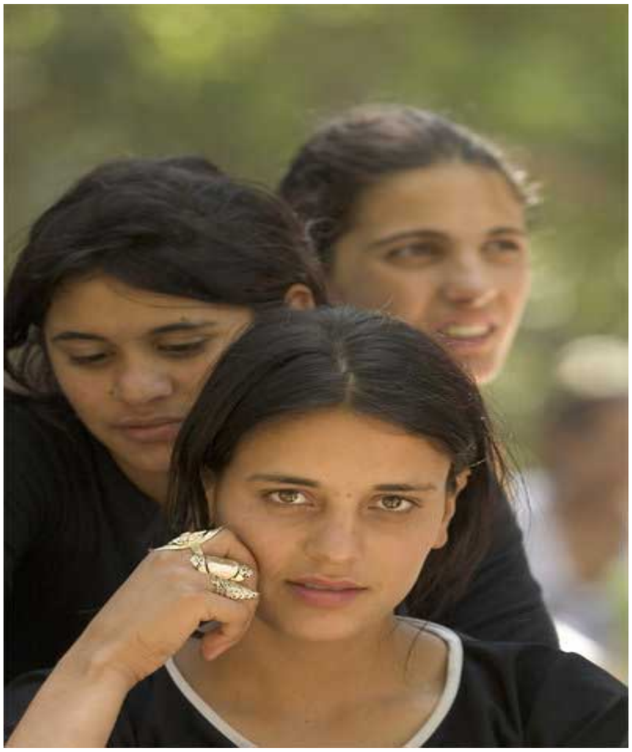

রোমারা যে অঞ্চলে বসবাস করে সে অঞ্চলের মেজরিটির ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাই ওদের একক কোন ধর্ম নেই। তুরস্কে, আলবেনিয়ায় এবং কসোভোতে বসবাসকারী রোমারা মুসলমান। আবার উত্তর আমেরিকায় এবং বৃটেনে বসবাসকারী রোমারা ক্যাথলিক। পূর্ব ইওরোপের, যেমন বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি এবং সার্বিয়ায় বসবাসকারী রোমারা পালন করে অর্থডগস ধর্ম। রোমানি ভাষায় বেশকিছু উপমহাদেশিয় শব্দ আছে, যেমন: পাঁচ, পানি ইত্যাদি। রোমাদের উচ্চতা গড়পরতা, তবে বাঙালীদের চেয়ে খানিকটা লম্বা। ওদের গায়ের রঙ শ্যামলা থেকে উজ্জ্বল শ্যামলা। চুল কালো, নাক খাড়া এবং চোখ কালো। রোমা মেয়েরা দেখতে খুবই সুন্দর। দিঘির মতো টলমলে কালো চোখের মেয়েরা ওদের দীঘল কালো চুল উড়িয়ে যখন এই শ্বেতবর্ণের নারীদের মাঝে হেঁটে বেড়ায় তখন পুরুষমাত্রই কেঁপে ওঠে ভিন্ন সৌন্দর্যের তাপে।

ছোট্ট নদীটির পাড়ে আমাদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এক শ্বেতবর্ণের পঞ্চাশোর্ধ পুরুষ এগিয়ে এলেন। ওর গায়ে ভেড়ার লোমের ওভারকোট, মাথায় কালো হ্যাট। কাছে এসে বেশ শুদ্ধ ইংরেজীতে কথা বলতে শুরু করলেন। আমরা ভেবেছিলাম, বুঝি আমাদের মতো কোন সৌখিন পর্যটক। সে তার নাম জানালো থমাস। বাড়ি জার্মানী। এই গ্রামে আছে প্রায় দেড় বছর। এক রোমা মেয়েকে বিয়ে করে সে এখানেই রয়ে গেছে। আগে একটি এনজিওতে কাজ করতো। এখন কিছুই করে না। হাস-মুরগি পালে আর বউকে নিয়ে এই নদীর পাড়ে ঘুরে বেড়ায়। থমাস কি প্রায়শ্চিত্য করছে? রোমাদের ওপর সমগ্র ইউরোপে বিভিন্ন সময়ে প্রচুর নির্যাতন হয়েছে। কমিউনিস্ট আমলে পূর্ব ইওরোপের অনেক দেশে রোমাদের সাংস্কৃতিক চর্চা নিষিদ্ধ ছিল। বুলগেরিয়ার সরকার এ সময় রোমা ভাষায় কথা বলা এবং রোমা

সংগীত পরিবেশন নিষিদ্ধ করে দেয়। চেকোস্লোভাকিয়ায় রাষ্ট্রীয় পলিসি হিসাবেই রোমা নারীদের জোর করে লাইগেশন করিয়ে দেয়া হতো, যাতে রোমা সম্প্রদায় আর বাড়তে না পারে। নব্বুইয়ের দশকের শুরুতে জার্মানী এক লক্ষ অবৈধ রোমা অভিবাসীকে পূর্ব ইওরোপে পুশ করে। ৫'শ বছর ধরে রোমারা রোমানিয়াতে ক্রীতদাস হিসাবে বসবাস করে। ইওরোপের অন্যান্য সকল স্থানে এথনিক ক্লিনজিংয়ের কবলে পড়ে ওরা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলারের নাজিবাহিনী ২ লক্ষ থেকে ৮ লক্ষ রোমা নিধন করে। এদের অধিকাংশই ছিল জার্মানীর বিভিন্ন কারাগারে। ওখানেই এদেরকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়। উন্নত বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই একথা প্রচলিত যে 'রোমাদের কাছ থেকে সাবধান'। চুরি, ছিনতাইয়ের মতো ছোটখাট অপরাধে রোমাদের প্রায়শই লিপ্ত হতে দেখা যায়। থমাসের দেশ জার্মানী নির্বিচারে রোমাদের গণহত্যা করেছে। আর এই শ্বেতাঙ্গ পুরুষ সেই রোমা সম্প্রদায়েরই এক মেয়েকে বিয়ে করে সুখে-শান্তিতে বসবাস করছে। কি বিচিত্র এই পৃথিবী! কিন্তু আমি অবাক হচ্ছি, এই মেয়েটির পরিবার একজন বিজাতীয় পুরুষের কাছে কি করে মেয়ের বিয়ে দিল? সাধারণত রোমারা ওদের মেয়েদের অন্য কোন সম্প্রদায়ের ছেলের সাথে বিয়ে দেয় না। এখানে নিশ্চয়ই প্রেমঘটিত কোন ব্যাপার থেকে থাকবে, যা জাতিগত বিদ্বেষকে জয় করেছে।

থমাসের কাছ থেকে আমরা একটি লাল মোরগ কিনে ওখানেই জবাই করলাম।

সাথে করে একটি পোর্টেবল গ্যাস ওভেন নিয়ে এসেছি। একই পথ ধরে আবার ফিরতে শুরু করেছি দ্রাগাশের দিকে। যাওয়ার পথে হাতের ডানদিকে ছিল ভেলিটা, এখন সেটা বাঁয়ে। ডানদিক উঠে গেছে পাহাড়ের চূড়োয়। মাইল দুয়েক আসার পর বাঁদিকে তাকিয়ে দেখি দূরে একটি পাহাড়ের পেট ফুটো হয়ে ওখান থেকে ঝরঝর করে ঝরে পড়ছে এক ক্ষিপ্র জলধারা। পড়ছে গিয়ে প্রায় হাজারখানেক ফুট নিচে। ওখানে নিশ্চয়ই কোন নদীর উৎপত্তি হয়ে থাকবে। পাইনের ঘন বন আর একের পর এক পাহাড়ের সারি থাকার কারণে প্রপাতের পতনস্থলটা দেখা যাচ্ছে না। রকিব গাড়ি চালাচ্ছে। আমরা প্রায় সবাই একসঙ্গে বলে উঠলাম, এইখানে। ডানদিকে একটি অতি পরিচ্ছন্ন সিমিট্রি। তারই পায়ের কাছে একটি ট্যাপ থেকে অনবরত ঝরে পড়ছে ন্যাচারাল ঝর্ণার পানি। কসোভোর প্রায় সর্বত্রই এরকম ঝর্ণাকল দেখতে পাওয়া যায়। এগুলো সাধারণত উইন্টারে বেশি সচল থাকে। তুষারপাত বা বৃষ্টি হলেই এই ঝর্ণাকলগুলোর গতি বেড়ে যায়। দেখে মনে হয় পাহাড়ের পেটের ভেতর একটি পাইপ ঢুকিয়ে দিলেই অনবরত পানি পড়তে থাকে। আমরা নেমে পড়লাম। লটবহর বলতে একটি হাড়ি, একটি ছোট্ট গ্যাস ওভেন, কয়েকটি প্লেট-গ্লাস, একটি ছুরি, একটি চপিং বোর্ড, কিছু মশলার প্যাকেট, পিয়াজ, রশুন, টমেটোসহ সামান্য কিছু বেসিক মশলা ও ভেজ, কিছু চিপসের প্যাকেট, ডজনখানেক ড্রিংকসের ক্যান আর দুটি বিশাল সাইজের বুক। মুরগী কাটার দায়িত্ব পড়লো আমার ওপর। প্রথমে ভেবেছিলাম এ আর এমন কি, কিন্তু কাটতে গিয়ে যতটা না কষ্ট হয়েছে, তার চেয়ে হাজারগুন বেশি কষ্ট হলো যখন ওই ন্যাচারাল ঝর্ণাকলের ঠান্ডা পানিতে মাংসগুলো ধুতে শুরু করেছি। ঠান্ডায় কি হাত পোড়ে? আমার মনে হলো দুই হাত পুড়ে ঝলসে গেছে। আমি আর হাত নাড়াতে পারছি না। প্রথমে ঠান্ডায় হাত প্রচন্ড ব্যাথা করছিল। এখন মনে হচ্ছে পুরোপুরি অবস হয়ে গেছে। সানফ্লাওয়ার সিনেমাটির কথা মনে পড়ে। জার্মান সোলজাররা রাশিয়াতে তুষারের কবলে পড়ে কি কষ্টটাই না করতে করতে একে একে মরে যাচ্ছিলো। ঠান্ডায় ওদের রক্ত জমে গিয়েইতো ওরা মরতে শুরু করলো। আমারওকি তাহলে দুই হাতের রক্ত জমে বরফ হয়ে গেছে? তাপমাত্রা এখনো হিমাঙ্কের নিচে।

প্রায় একঘন্টা হয়ে গেছে। মাংস রান্না হওয়াতো দূরের কথা পাত্রই এখনো গরম হয়নি। অবশেষে আমরা হাল ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু মন্ডল নাছোড়বান্দা। এখানে মাংস রান্না করে খেয়ে তবেই বাড়ি যাবে। বেশ

তাই হবে। তবে সেটা কি করে সম্ভব? যেখানে হিমাঙ্কের নিচে তাপমাত্রা সেখানে বসে এই পিচ্চি ওভেনের টিমটিমে আগুন দিয়ে কি রান্না করা যাবে? মন্ডল বললো, যাবে। চুলাটা গাড়ির ভেতরে নিয়ে যেতে হবে। গাড়ির হিটার চালু করে দিয়ে তবেই রান্না করবো। আমরা সবাই হৈ হৈ করে উঠলাম। পাগল নাকি? গ্যাসের চুলা, সেটা নিয়ে যাবো গাড়ির ভেতরে? অসম্ভব এটা কিছুতেই হতে পারে না। কিন্তু মন্ডলের জেদের কাছে আমাদের যুক্তি হার মানলো। শেষ পর্যন্ত ও মুরগীর হাঁড়ি গাড়ির ভেতরে নিয়ে গেল। আরো প্রায় একঘন্টা পরে আধাসেদ্ধ মুরগীর মাংসের টলমলে ঝোল দিয়ে আলবেনিয়ান বুক ভিজিয়ে বরফের ওপর বসে আমরা লাঞ্চ করলাম বিকেল তিনটায়। মাংস ছিঁড়তে গিয়ে বুঝি কারো কারো দাঁতই বেরিয়ে আসার জোগাড়। মাংস ছিঁড়তে পারি আর না পারি, দ্রাগাশের পাহাড়চূড়োয় বসে নিজের হাতে রান্না করা তাজা মুরগীর ঝোল দিয়ে রুটি খেতে পেরে আমরা সকলেই বেশ থ্রিল্ড। এইরকম একটি অ্যাডভেঞ্চারের অভিজ্ঞতা বাঙালীজীবনে আর কখনো আসবে কি-না কে জানে?

শনিবার রাতটা মন্ডলের বাড়িতেই কাটালাম। রোববার সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি তুষারের নিচে ঢাকা পড়ে আছে সূর্যদেবতা। দুলতে দুলতে তুষারের দলা আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে। কাচের জানালায় চোখ রেখে দেখি রাস্তা ডুবে আছে তিনফুট বরফের নিচে। আমার বুক ধরাস করে উঠলো। আজই ছুটির শেষ দিন। যদি ফিরতে না পারি? আমার ইথিওপিয়ান বস একটা হারামীর হাড্ডি। সে ইতোটাই ইতর চাকরীও নট করে দিতে পারে। মন্ডল দাত বের করে হাসছে, চিন্তার কি আছে, যেতে না পারলে আরো দু'দিন বেড়াবেন।

সারাদিন বসে শুধু আল্লাহকে ডেকেছি। তিনটার দিকে তুষারপাত বন্ধ হলো। আমার উপুর্যপরি তাগিদে সবাই তৈরী হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। নিজাম ভাই খুব একটা কনফিডেন্ট ফিল করছেন না। এটাতো আর কানাডা কিংবা সুইজারল্যান্ড না। যে সাতসকালে মিউনিসিপ্যালিটির গাড়ি এসে বরফ সাফ করে গেছে। আমরা বাস করছি যুদ্ধবিধ্বস্ত এক জনপদে। যেখানে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে কখনো কখনো ১৬ ঘন্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ থাকে না। এখনো কোন কোন মিউনিসিপ্যালিটিতে পানীয় জলের সরবরাহ নেই। রান্না-স্নান সবই করতে হয় দোকান থেকে কিনে আনা বোতলের পানি দিয়ে।

সকাল থেকে এই তুষারপাতের ভেতর দিয়েও দুই/একটা গাড়ি চলছিল বলেই একটা ট্রেইল তৈরী হয়েছে। পথের দু'পাশে তৈরী হয়েছে ৪/৫ ফুট উঁচু বরফের পাঁচিল। এই পাঁচিল কতখানি শক্ত কে জানে? যদি খুব শক্ত হয়ে থাকে তাহলে অন্তত একটা উপকার হবে, গাড়ি ছিটকে রাস্তার বাইরে যেতে পারবে না। স্নো-চেইন লাগাতে গিয়ে টের পেলাম, বরফের দেশে ড্রাইভ সত্যিই এক কঠিন অভিজ্ঞতা। আমাদের তিনজনেরই হাত অবশ হয়ে গেছে। নিজাম ভাই স্টিয়ারিং ধরতে পারছেন না। গাড়ির হিটার ফুল করে দিয়ে তিনি হিটারে হাত চেপে বসে আছেন।

মন্ডল আমাদের বিদায় দিয়ে ঘরে ফিরে গেল। আমাদের গাড়ি চলছে ২০ কিলোমিটার গতিতে। এই গতিতে চলতে থাকলে কখন আমরা এই এক'শ কিলোমিটার পথ পাড়ি দেব? কিছুক্ষণের মধ্যে কয়েক মিনিটের জন্য এক ঝলক সূর্যের মুখ দেখতে পেলাম। আবার সেই অন্ধকার। তবে এখন আর তুষারপাত হচ্ছে না। সেই হেয়ারপিন বেন্টের কাছে এসে নিজাম ভাই জোরে জোরে আল্লাহ রসুলকে ডাকতে শুরু করলেন। আমরা সবাই তাকে ফলো করলাম, রমাদি'রও ঠোঁট নড়ছে। তিনি কাকে ডাকছেন কে জানে। হঠাৎ শুনলাম, তার কণ্ঠ থেকে ভেসে এলো একটা ক্ষিণ আওয়াজ, জেসাস ক্রাইস্ট।

হেয়ার পিন বেন্টটি সহিসালামতে পার হতে পেরে আমারা যারপরনাই আনন্দিত। মনে হচ্ছে এক দুঃসাহসী ভয়েজে বেরিয়ে নতুন এক মহাদেশ আবিস্কার করে ফেলেছি কলম্বাসের মতো। সামান্য একটু সমতল পেয়েই আমরা সবাই লাফালাফি করে গাড়ি থেকে নেমে গেলাম। বরফে গড়াগড়ি করে অনেকগুলো ছবি তুললাম। সামনে এখনো ৯০ কিলোমিটার পথ। অথচ আমাদের মধ্যে ভয়ের তেমন ছিটেফোটাও আর নেই। ভাবটা এমন, এভারেস্টের চূড়োয় যখন উঠে গেছি, তখন নামতে পারবোই।

শৃঙ্গজয়ী চার দুঃসাহসী অভিযাত্রী পুনরায় গাড়িতে উঠে বসলাম। নিজাম ভাই আস্তে আস্তে গাড়ির গতি বাড়াচ্ছেন। এটা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের দলনেতা এখন অনেক বেশি কনফিডেন্ট। স্টিয়ারিংয়ে তার আত্মবিশ্বাসী হাতের ওপর হাত রেখে বললাম, একটু আস্তে যাওয়াই ভালো। পাহাড়টা পার হই, হাইওয়েতে উঠে না হয় জোরে চালানো যাবে।

হাইওয়েতে উঠে আমাদের আক্কেলগুড়ুম। ভেবেছিলাম পিচঢালা রাস্তার কালো বুকটা অন্তত দেখা যাবে। পুরো রাস্তায় এলোপাথারী অসংখ্য ট্রেইল। ওপরে শুভ্র তুষার থাকলেও ট্রেইলগুলোতে ভয়ঙ্কর ব্লাক আইস জমাট বেঁধে আছে। কোন কারণে একবার ব্রেক-এ পা দিলেই গাড়ি ছিটকে যে কোন দিকে চলে যাবে। অতি মন্থর গতিতে গাড়ি চলছে। আমরা এগিয়ে যাচ্ছি প্রিজরেনের দিকে। সামনের রাস্তার ওপর শুধু চালকের নয়, আমাদের আটটি চোখ একসঙ্গে শার্দুলের মতো তাকিয়ে আছে। টানটান স্নায়ু, যে কোন সময় যে কোনকিছু ঘটে যেতে পারে।

প্রিজরেন পর্যন্ত আমরা নিরাপদেই আসতে পারলাম। শহরের বিশাল বিশাল স্কয়ারগুলোতে বরফের স্তুপ জমে আছে। ইচ্ছে ছিল কোন একটি রেস্টুরেন্টে ঢুকে গরম গরম এক কাফ ধুমায়িত কফি খেয়ে নেব। কিন্তু ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আমাদের সে পরিকল্পনার রূপসী পরীকে আকাশে উড়িয়ে দিলাম, আর কল্পনার কঙ্কালটাকে জাপটে ধরে পুনরায় গাড়ি স্টার্ট দিতে বাধ্য হলাম।

এখন ছয়টা বাজে। ত্রিশ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে আমাদের তিন ঘন্টা লেগে গেছে। সামনে এখনো ৭০ কিলোমিটার। এই গতিতে চলতে থাকলে রাত একটার আগে বাড়ি পৌছাতে পারবো না। এখান থেকে প্রিষ্টিনায় যাওয়ার দুটি রাস্তা আছে। একটি সুহারেকা হয়ে, অন্যটি মালিশেভো হয়ে। মালিশেভো হয়ে যে পথটি গেছে সেটি বেশ ঘোরালো, তবে এ পথে পাহাড়ি পথ কম আর সুহারেকা হয়ে যেটি গেছে সেটি অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত এবং এটিই প্রিস্টিনা যাওয়ার প্রধান রাস্তা, তবে ভীষণ পাহাড়ি। সিদ্ধান্ত

নিলাম, এইরকম দূর্যোগের দিনে প্রধান এবং সবচেয়ে সচল রাস্তায় যাওয়াই ভালো হবে। যে রাস্তায় কম গাড়ি চলে ওখানে ভালো ট্রেইল না-ও পেতে পারি। আধঘন্টা পরে ঘটাং ঘটাং একটি শব্দ শুনতে পাচ্ছি। গাড়ির ভেতরে? নিজাম ভাই প্রশ্ন করলেন। আমি বলি, না বাইরে, তবে গাড়ির নিচে মনে হচ্ছে। নিজাম ভাই হাইওয়ের ওপরই একটু সাইড করে গাড়ি থামিয়ে দিলেন। নেমে দেখি আমাদের স্নো চেইন খুলে গেছে।

প্রায় ৪৫ মিনিট বরফের ওপর শুয়ে বসেও স্নো চেইনটি আর লাগাতে পারলাম না। ঠান্ডায় আমরা জমে যাচ্ছি। আমাদের এই দুরোবস্থা দেখে মুক্তি এবং রমা'দির মুখও কাঁদো কাঁদো হয়ে গেছে। আমি গাড়িতে উঠতেই মুক্তি গ্লাভসের ভেতর থেকে ওর উষ্ণ হাত বের করে আমার হাত দুটো চেপে ধরলো। আমরা দু'জনই গাড়ির হিটারের ওপর হাত রেখে কিছুক্ষণ বসে রইলাম। রাত মেনে গেছে অনেক আগেই। তবে অতি আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, ঘুটঘুটে অন্ধকারতো দূরের কথা রাতের যে স্বাভাবিক অন্ধকার তা-ও নেই। অতি দূরের তুষারে ঢাকা ক্রিসমাস ট্রি-টাও দেখা যাচ্ছে। পুরো কসোভোটাই যেন বিশাল একখন্ড হীরার পাথরে পরিণত হয়েছে এই তুষারের রাতে। যতো দূর চোখ যায় যেন ভূ-খন্ড থেকে এক অলৌকিক আলোর ভাপ উঠছে আকাশে। সেই আলোতে পথ দেখে আমরা অতি সাবধানে এগুচ্ছি। আধমন ওজনের স্নো-চেইন দুটো গাড়ির পেছনে তুলে নিলাম।

সুহারেকায় এসে দেখি শত শত গাড়ি থেমে আছে। এরি মধ্যে আবার তুষারপাত শুরু হয়ে গেছে। সেই সাথে ঝড়ো বাতাশ। ইংরেজীতে এই তুষারঝড়কে বলে ব্লিজার্ড। আমরা ব্লিজার্ডে পড়ে এখন পুরোপুরি দিশেহারা। জাতিসংঘের পুলিশের সাথে স্থানীয় পুলিশগুলো প্রাণপন চেষ্টা করে যাচ্ছে যানজট ছাড়াতে, কিন্তু কোন কাজ হচ্ছে না।

দু'জন ফারের ওভারকোট পরা বুলগেরিয়ান পুলিশ এসে যখন আমাদের গাড়ির চাকায় টর্চের আলো ফেলে বললো, তোমরা এ পথে যেতে পারবে না। তখন বুঝলাম এই যানজটের কারণ। আমরা এখন একটি পাহাড়ের টিকিতে অবস্থান করছি। এখান থেকে সামনের পথ খাড়া নেমে গেছে কয়েক হাজার ফুট নিচে। যেসব গাড়ির সিসি কম এবং যেসব গাড়িতে স্নো-চেইন নেই, সেসব গাড়িকে ওরা যেতে

দিচ্ছে না। আমাদের কি এখানেই থাকতে হবে সারারাত, এই গাড়ির ভেতরে? যদি তেল ফুরিয়ে যায় তাহলেতো জমে আইস হয়ে যাবো। কাল সকালে রেস্কিউ টিম এসে চারটি তক্তা হয়ে যাওয়া ডেডবডি বের করবে গাড়ির ভেতর থেকে। বাংলাদেশের মানুষ হয়ে বরফে জমে মৃত্যু? পুলিশ দু'জন বললো, বাঁ দিক দিয়ে একটি রাস্তা আছে। এই রাস্তায় তোমরা মালিশেভো পর্যন্ত যেতে পারবে। রাস্তা তেমন ভালো না, তবে খুব খাড়া পাহাড়ি না, তোমরা যেতে পারবে। আমরা চারজন চারজনের চোখের দিকে তাকালাম। আটটি চোখ একটি বিন্দুতে মিলিত হয়ে যেন চারজনের শরীরে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিল।

বিপদে ধৈর্য হারাতে নেই। কিন্তু কতো আর ধৈর্য রাখবো? বাঁ দিকের পথে গাড়ি ঘোরানো ছাড়া এই মুহূর্তে আর কোন বিকল্প নেই। কিন্তু বাঁ-দিকের পথটিতো আমরা কেউ-ই চিনি না। এই তুষার ঝড়ের রাতে অচেনা পথে পা বাড়ানো কি ঠিক হবে? আমাদের আসলে আর কোন অপশন নেই।

নিজাম ভাই কারো সাথে আর কোন পরামর্শ না করে গাড়ি ঘোরালেন। আমরা কচ্ছপের গতিতে এগুচ্ছি। পুরো রাস্তাটি ডুবে আছে ঘন তুষারের নিচে। এ পথে গত কয়েক ঘন্টায় কোন গাড়ি গিয়েছে কি-না সন্দেহ আছে। ডানে-বায়ে পাতাঝরা ন্যাড়া গাছপালার ওপর তুষার জমে এক একটা গাছ খড়ের গাদার আকার ধারন করে ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে। শাদা মানুষের দেশে শাদা ভূত। দুলতে দুলতে তুষার পড়ছে। গাড়ির ফ্রন্ট এবং ব্যাক ওয়াইপার অনবরত চলছে ইউন্ড স্ক্রিনের তুষার সাফ করার জন্য। পথের ওপর বেশ খানাখন্দ আছে। বরফে ঢাকা বলে তা বোঝা যাচ্ছে না। গাড়ি দুলছে নৌকার মতো। আল্লাহই জানে, যদি বড় ধরণের কোন গর্ত থেকে থাকে তাহলে এখানেই আটকে পড়ে থাকতে হবে সারারাত। এখান থেকে এই মাঝরাতে আমাদের কেউ উদ্ধার করতে আসবে না।

কতক্ষণ ধরে যে চলছি কে জানে। পথ যেন আর শেষ হতে চায় না। চলছিতো চলছিই। এতোক্ষণে একটি বেসিক প্রশ্ন উঁকি দিলো আমাদের ভীত-সন্ত্রস্ত মনের জানালায়। আমরা ঠিক রাস্তায় যাচ্ছিতো?

সামনে পেছনে আর কেউ নেই। এই দুঃসহ রাত্রির যাত্রায় আমরাই একমাত্র যাত্রী। এমনতো না আমরা কোন অজানা দেশের দিকে ছুটে চলেছি? যদি পথ ভুলে সার্বিয়ায় ঢুকে পড়ি, তাহলে সার্বিয়ান বর্ডার ফোর্সের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাবো। আতঙ্কে আর ঠান্ডায় আমাদের মুখগুলো চুষে খাওয়া আমের মতো হয়ে গেছে।

এই দুঃসহ রাত্রির দুঃসাহসী যাত্রার একমাত্র গাড়িটির হেডলাইট থেকে বিচ্ছুরিত আলো শুভ্র তুষারসমুদ্রে প্রতিফলিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে চারপাশে। সেই আলোতে আমরা দেখছি আকাশ থেকে দুলতে দুলতে নানান আকৃতির তুষারের দলা নেমে আসছে। ভয়-আতঙ্ক ছাপিয়ে মাঝে মাঝে আমরা এই অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে আনন্দে শিহরিত হচ্ছি বৈ-কি।

এক জায়গায় এসে দেখি একটি রাস্তা সোজা সামনের দিকে চলে গেছে, আর একটি গেছে সামান্য ডানে বাঁক নিয়ে প্রায় সমান্তরাল সামনের দিকে। এখন আমরা পুরোপুরি কনফিউজড। কোনদিকে যাবো? রাত এখন নয়টা। এক্সপেরিমেন্টের সময় নেই। সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে না পারলে মহাবিপদে পড়বো। আমরা এখন প্রিস্টিনা থেকে কতটা দূরে আছি কোন ধারণা নেই আমাদের কারোরই। যদিও ল্যান্ড-ডিমাইনিংয়ের কাজ প্রায় শেষ, তারপরও কিছুই বলা যায় না। ৯৯ সালের মে-জুন মাসে সার্বিয়ান আর্মি সারা কসোভোতে যে পরিমান ল্যান্ডমাইন পুতেছে এর যে কোন একটি যে কোন সময় বরফ-মাটি ভেঙে আকাশে লাফিয়ে উঠতে পারে। সেই সাথে আমাদের গাড়িটিও শূন্যে লাফিয়ে উঠবে। তিন-রাস্তার মুখে, ওয়াই জংশনটিতে এসে দ্বিধান্বিত আমরা গাড়ি থামিয়ে দাঁড়িয়ে আছি।

হঠাৎ ভেল্কিবাজির মতো একটি প্রাইভেট কার, বেশ পুরোনো, ডানদিকের রাস্তা থেকে ভুশ করে বেরিয়ে এসে সোজা রাস্তা ধরে সামনে চলতে লাগলো। আমরা কি ওটাকে ফলো করবো? সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। অন্তত ল্যান্ডমাইনের কবলে পড়ার সম্ভাবনা থাকবে না। আমাদের গাড়ির হেডলাইটের আলোয় সামনের গাড়ির নম্বরটি পড়তে পারছি, এইচভি-২৪৪৩৪। এইচভি? এর মানে কি? চারজনের মাথাই ঘামছে কিন্তু কোন ফল আসছে না। এরকম নম্বরের কোন গাড়ি নেই কসোভোতে। সাধারণত কসোভোর নম্বরগুলো হয়, দুপাশে তিনটি তিনটি করে ছয়টি নিউমেরিক ডিজিট আর মাঝখানে ইংরেজীতে লেখা কেএস। আশপাশের কোন দেশের নম্বরওতো এরকম না। তাহলে এই গাড়িটি এলো কোত্থেকে আর কোথায়ইবা যাচ্ছে? গাড়ির ভেতরে ক'জন আছে, ওরা কি ধরণের লোক দেখার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলাম আমরা চারজনই। কিন্তু কিছুই দেখা যাচ্ছে না। স্টেশন ওয়াগনের মতো গাড়িটি, শাদা কিংবা ধুসর রঙের হবে। তবে রঙের প্রলেপ ওর গা থেকে অনেক আগেই খসে পড়েছে বলে মনে হচ্ছে। অতি আশ্চর্যরকমভাবে ওর গায়ে তেমন বরফ নেই। পেছনে বেশ কিছু মালামাল দেখা যাচ্ছে, উল্টো করে রাখা একটি সুদৃশ্য চেয়ারের পা দেখতে পাচ্ছি আমরা। এ ছাড়া গাড়ির ভেতরের আর কিছুই নজরে আসছে না। নিজাম ভাই মাঝে মাঝে হাই বিম দিয়েও দেখার চেষ্টা করছে কিন্তু কোন চেষ্টাই কাজে লাগছে না।

বরফের রাস্তায় খানা-খন্দে পড়ে সামনের গাড়িটি নৌকার মতো যখন দুলে ওঠে তখন চালকের আসনে বসা কারো মাথা ডানে-বাঁয়ে নড়া-চড়া করলে একটি কালো হ্যাট দেখা যায় হঠাৎ হঠাৎ। সেকেন্ড সিটে কিংবা পেছনের সিটে কেউ আছে বলে মনে হচ্ছে না। শাদা কিংবা ধুসর প্রাইভেট কারটি একটি নির্দিষ্ট গতিতে একই ছন্দে এগিয়ে চলেছে। সেই গতি কুড়ি কিলোমিটারের বেশি হবে না। মনে হচ্ছে গন্তব্য সম্পর্কে সামনের গাড়ির চালক খুবই কনফিডেন্ট, আমাদের মতো কনফিউজড না। আমরাও গতির তাল ঠিক রেখে ওকে অন্ধ অনুসরণ করছি।

চলছিতো চলছিই, পথ এবং রাত কোনোটাই যেন শেষ হতে চায় না। নিজাম ভাইয়ের প্যালেস্টিনিয়ান একজন বালিকা বন্ধু আছে, ওর নাম সাহার। সাহারকে ফোন করার একটা তাগিদ অনুভব করছেন তিনি। আমি মোবাইলটা পকেট থেকে বের করে দেখি নেটওয়ার্ক নেই। এবার আমদের সকলেরই কলিজায় কামড় পড়লো। তাহলে কি আমরা কসোভোর বাইরে কোথাও চলে এসেছি? এখন আমরা কি করবো? থেমে পড়বো? গাড়ি ঘুরিয়ে আবার উল্টো পথে যাবো? কারো মাথাই কাজ করছে না। নিজাম ভাই জানালেন গাড়ির ফুয়েল ট্যাংকের অবস্থাও তেমন ভালো না।

রমাদি বেশ দৃঢ় গলায় বললেন, সামনের গাড়ি ফলো করুন। এরকম বিপদে এ ধরনের কঠিন নির্দেশ খুবই দরকার। আমরা সবাই যুগপৎ অবাক। এটা কি রমাদির কণ্ঠ? যিনি সবসময় হালকা রসিকতা করতেই পছন্দ করেন তিনি এই দুঃসময়ে এতোটা দৃঢ়? এই দৃঢ় নির্দেশটি আমাদের জন্য খুবই দরকার ছিল। মুক্তিও তাতে যোগ দিলো। সামনের গাড়িটি নিশ্চয়ই কোনো লোকালয়ে যাবে। প্রিস্টিনায় যেতে পারি আর না পারি ওকে ফলো করে আমরা অন্তত কোনো লোকালয়ে পৌঁছে যেতে পারবো।

কেটে গেল আরো একঘন্টা। সামনে একটা বড় হাইওয়ে দেখা যাচ্ছে। প্রচুর আলো জ্বলছে। আমাদের চোখগুলো আনন্দে অশ্রুসজল হয়ে উঠলো। হাইওয়েতে উঠে প্রথম দশমিনিট কিছুই বুঝতে পারছিলাম না, এটা কোন রাস্তা। সামনের ফুয়েল স্টেশনে গিয়ে গাড়ি থামালাম। তখনি সব পরিস্কার হয়ে গেল। আমরা আসলে প্রিস্টিনা থেকে আর বড়জোর ত্রিশ কিলোমিটার দূরে। এই রাস্তা আমাদের সোজা প্রিস্টিনায় নিয়ে যাবে।

এরি মধ্যে আমরা সেই অলৌকিক গাড়িটি হারিয়ে ফেলেছি। তুমি যে-ই হও ভাই, তোমাকে ধন্যবাদ এই দূর্যোগের রাতে পাঞ্জেরী হয়ে আমাদের পথ দেখাবার জন্যে।

আবিদজান, আইভরিকোস্ট
১৭ জানুয়ারী, ২০০৭